ভূমিকা

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলা নাটকের যে পথচলা সফলভাবে শুরু হয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের প্রেক্ষাপটে আর্থ-সামাজিক অভিঘাতে তার গতিমুখ পরিবর্তিত হয়। দুই দশকের মধ্যে ঘটে যাওয়া দুই ভয়াবহ মহাযুদ্ধের প্রত্যাঘাতে শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই ভয়াবহ মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অভিঘাত শিল্পী-সাহিত্যিকদের ভাবের পরিবর্তনে সক্রিয় অনুঘটকের কাজ করে। বাংলা নাটকে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে স্বাধীনতাপূর্ব, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটকের বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, চরিত্রচিত্রণ, সংলাপ ভাবনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিরাট বৈসাদৃশ্য ঘটে। এই সময়কালে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে আবির্ভাব ঘটে বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, সলিল সেন, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, বাদল সরকার, নাট্যাভিনেতা শম্ভু মিত্র, মনোজ মিত্র প্রমুখ নাট্যকারদের। বিশ শতকের ষাটের দশকের নাট্য আন্দোলনের অন্যতম একটি ধারা হল অ্যাবসার্ড নাটক। এই ধারার সূত্রপাত ঘটে বাদল সরকারের হাতে। বাংলা অ্যাবসার্ড নাটকের ধারাকে সমৃদ্ধ করতে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। নাট্যকার বাদল সরকার ও তাঁর নাটক নিয়ে বহু গবেষণাধর্মী আলোচনা হলেও সমকালে আবির্ভূত সমধর্মী নাটকের সার্থক স্রষ্টা হয়েও নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে গবেষণাধর্মী আলোচনা অনেক কম। তাই নাট্য সংস্কৃতির ধারায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের অবদান এবং তাঁর শিল্পসৃষ্টির সামগ্রিক বিশ্লেষণের জন্য আমার গবেষণার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছি ‘মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক: জীবন ও শিল্প’ বিষয়টি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা নাটকের ইতিহাসে মোহিত চট্টোপাধ্যায় একজন উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট নাটককার। বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রথম পরিচিতি কবি হিসেবে ঘটলেও মানবিক মূল্যবোধের কারণে তাঁর অতৃপ্ত কবিসত্তা পথ পরিবর্তন করে। কবিতার কল্পনা সুন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পাড়ি দেন নাটকের জগতে। একাধারে তিনি ছিলেন কবি, চিত্রনাট্যকার, প্রাবন্ধিক এবং নাটককার। স্বতন্ত্র ধারায় নিজস্ব রীতিতে তিনি বাংলা নাট্যমঞ্চকে উপহার দিয়েছেন নতুন নাটক, নতুন ভাবনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিক জীবনের বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা, অস্তিত্বের সংকটের পাশাপাশি ভগ্ন মানবসত্তা ও অবক্ষয়িত সমাজসত্তার প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরার জন্য এমন শিল্পরীতির অনুসন্ধান করেছিলেন তিনি যা প্রথাগত ধারা থেকে স্বতন্ত্র। মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রায় শতাধিক দীর্ঘ ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটকের মধ্যে তাঁর মানব কল্যাণমূলক চিন্তাভাবনাকে নিবদ্ধ করেছেন। তাঁর নাটকে প্রতিফলিত জীবন ও শিল্পরূপকে যথাযথ ও সুচারুরূপে পর্যালোচনার জন্য 'মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক: জীবন ও শিল্প' বিষয়টিকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। অধ্যায়গুলি নিম্নরূপ—

প্রথম অধ্যায় : মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ও সমকাল

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলা নাটকের পর্বান্তর

তৃতীয় অধ্যায় : মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে তত্ত্বভাবনা

চতুর্থ অধ্যায় : মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে জীবনদর্শন

পঞ্চম অধ্যায় : মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সমসাময়িক নাট্যকার : জীবন ও শিল্পরূপায়ণে স্বাতন্ত্র্য

ষষ্ঠ অধ্যায় : মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ

শিল্পী বেঁচে থাকেন তাঁর শিল্প সৃষ্টির মধ্যে। শিল্পসৃষ্টির নেপথ্য থাকে শিল্পীর ব্যক্তি জীবন ও তাঁর সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট। স্বাধীনতা-উত্তর বিশ শতকের ষাটের দশকের নাটককার 'মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক: জীবন শিল্প' বিষয়টি আলোচনা সূত্রেই স্বাভাবিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নাটককারের ব্যক্তিজীবন পরিচয় সমকালীন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পটভূমি। কেননা জীবনদর্শন, চরিত্র-চিত্রণ, সমাজভাবনা, আঙ্গিক, বিষয় নির্বাচন সব কিছুই উঠে আসে নাটককারের সমসাময়িক সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর নাট্য আন্দোলনের ধারায় বাংলা নাটকের সমৃদ্ধির ইতিহাসে খ্যাতিমান নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় ১লা জুন ১৯৩৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৩২-৩৪ সালে সারা ভারতে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। ১৯৩৪ সালে এদেশে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল শাখারূপে স্বীকৃতি পায়। মোহিত চট্টোপাধ্যায় শৈশবেই প্রত্যক্ষ করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীভৎস ধ্বংসলীলা, ১৯৪২-এর ভারতছাড়ো আন্দোলন ও আগস্ট আন্দোলন। ১৩৫০ সালে ভয়াবহ বন্যা, দুর্ভিক্ষজনিত অর্থনৈতিক সংকট ও খাদ্য সংকট দেখা দেয় বাংলায়। দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে বিজন ভট্টাচার্যের লেখা 'নবান্ন' নাটকের মাধ্যমে বাংলা গণনাট্য আন্দোলনের সফল সূচনা হয়। ১৯৪৩ সালের ২৫ মে আনুষ্ঠানিক ভাবে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-এর প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৪৫ সালে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করলেও অখণ্ড ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা থামলেও মানুষের মনের মধ্যে হিংসা, স্বার্থপরতা, লোভ, লালসা বিন্দুমাত্র অপসৃত হয় না। ১৯৪০ সালে বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয় বালক মোহিতের শিক্ষাজীবন শুরু হয়। কলকাতায় আসার সময় তাঁর বয়স

ছিল মাত্র ১৩ বছর (মতান্তরে ১১ বছর)। উত্তর কলকাতার সিটি কলেজে বাংলা বিষয়ে অনার্স নিয়ে বি.এ পাস করেন তিনি। ১৯৫৩ সালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত কৃত্তিবাস পত্রিকায় কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পাশাপাশি প্রধান সারির কবি হয়ে ওঠেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়ও।

১৯৫৪ সালে শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' নাটকের প্রথম নাট্যাভিনয় কিশোর মোহিতকে বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়। ১৯৫৫ সালের ২৬ আগস্ট বসু-শ্রী বীণা-শ্রী সিনেমায় সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'পথের পাঁচালি' ছবি দেখে উদ্দীপিত হয়ে ওঠেন তিনি। ১৯৫৬ সালে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আষাঢ় শ্রাবণে' প্রকাশিত হয়। ১৯৫৭ সালে চালকল শ্রমিক এবং বন্দর কর্মীরা আন্দোলনের জন্য পথে নামে। ১৯৫৮ সালে উদ্বাস্তু আন্দোলন পুনরায় শুরু হয়। ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটে বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবীগর্জন' নাটকে। ১৯৬৩ সালের গান্ধর্ব পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম নাটক 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যজগতে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই নাটকের ঘটনাক্রমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রেক্ষাপটের প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৬৪ সালে ভারতের সাম্যবাদী দলের দ্বিখণ্ডীকরণ ঘটে। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয় মোহিতের তৃতীয় নাটক 'মৃত্যুসংবাদ'। উদ্ভট কাহিনি কেন্দ্রিক এই নাটক প্রকাশের পর থেকে মোহিত চট্টোপাধ্যায় অ্যাবসার্ড নাট্যধারার একজন বিশিষ্ট নাট্যকার হিসেবে চর্চার কেন্দ্র বিন্দু হয়ে ওঠেন। ১৯৫৯-এর খাদ্য আন্দোলন পুনরায় শুরু হয় ১৯৬৬ তে। ১৯৬৭ সালের মে মাসে উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি আন্দোলন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক মাইলস্টোন রূপে চিহ্নিত। এরকম এক জটিল রাজনৈতিক পটভূমিকে কেন্দ্র করে ১৯৭০ সালে মোহিতের 'রাজরক্ত' নাটকটি রচিত। 'রাজরক্ত' থেকে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক রচনায় পর্বান্তর সূচিত। একই ক্রমে

তিনি প্রায় শতাধিক নাটক রচনা করেন। মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর শেষ নাটক 'তথাগত'র মধ্য দিয়ে বৌদ্ধ দর্শনের আদর্শের কথা বলেছেন। ২০১২ সালের ১২ই এপ্রিল গলায় ক্যান্সারের কারণে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর সমগ্র জীবন, শিল্প সৃষ্টি ও সমকালের রূপরেখা এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

সাহিত্য সমাজের দর্পণ, নাটক তার প্রত্যক্ষ মাধ্যম। সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। সমাজের সঙ্গে সঙ্গে নাটকও বদলে যায়। উৎস সূত্রে নাটক বিনোদনের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট অনুকরণ মুলক শিল্পকর্ম। নাটক একইসঙ্গে আনন্দ বিনোদনের পাশাপাশি সমকালীন আর্থ-সামাজিক জীবনসমস্যা ও সমাধানের মাধ্যমও। উৎস লগ্ন থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত অতিক্রান্ত বাংলা নাটকের সুদীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলা নাটকের পর্বান্তর ঘটেছে বার বার। শুধু আর্থ-সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নয়, নাটকের পর্বান্তর বিভাজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে রঙ্গালয়, নাটকের আঙ্গিক, চরিত্রচিত্রণ, নাটককারের জীবনদর্শন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ষাটের দশকের নাট্য আন্দোলনের অন্যতম সফল নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের বিষয়বৈচিত্র্য, জীবনদর্শন, শিল্পভাবনা প্রভৃতি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত। এই স্বতন্ত্র ধারার সূত্রপাত হঠাৎ করে শুরু হয়ে যায়নি। তার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এই দীর্ঘ ইতিহাসকে সংক্ষেপে পর্যায়ে আলোচনার জন্য অধ্যায়টিকে চারটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। এই পর্ব বিভাজনের গুরুত্ব নিম্নরূপ—

প্রথম পর্ব:— এই পর্বে নাট্য লক্ষণ যুক্ত রচনাগুলিকে উল্লেখ করা হয়েছে। সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যায় বাংলা নাটক ও বাংলা উপন্যাসের সফল সূচনা প্রায় একই কালে। ইতিহাসের তথ্য অনুসারে ১৮৫২ সালে জি. সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' নাটকটিকে মৌলিক নাটক রচনার সূত্রপাত বলা হয়। ১৮৫২ সালের আগে পর্যন্ত

বাঙালি দ্বারা বাংলা নাটক চর্চার দৃষ্টান্ত এই পর্বে লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রাচীনকালে ধর্মানুষ্ঠানে নৃত্যগীত ইত্যাদি দ্বারা মানুষ অনুকরণ প্রচেষ্টাকে রূপায়িত করে। এই অনুকরণ করার সহজাত প্রবৃত্তি থেকে নাটকের সৃষ্টি। বাংলা নাটকের অঙ্কুরের প্রথম বিকাশ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়কে কেন্দ্র করে। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এর তিনটি চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক দ্বন্দ্ব-সংঘাত নাট্য আবেদনের সৃষ্টি করে। রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদমূলক রচনায় নাটকীয় আবেদন পরবর্তীকালে পৌরাণিক নাট্যধারার প্রধান আধার হয়ে ওঠে। বাংলা নাটকের উদ্ভবের পূর্বে বিদ্যাসুন্দর কাহিনির নাট্যরূপ অভিনীত হয় বাঙালি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সৌখিন রঙ্গালয়ে। এছাড়া কবিগানের মধ্যেও নাটকীয় উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা নাটকের সূত্রপাত গেরাসিম লেবেডেফের হাতে ১৭৯৫ সালে 'Love is the Best Doctor' ও 'The Disguise' এর বাংলা অনুবাদ মঞ্চস্থ হওয়ার মাধ্যমে।

দ্বিতীয় পর্ব: ১৮৫২ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক পর্বের কালসীমায় রচিত নাটকের আঙ্গিক, বিষয়, সংলাপ, চরিত্র প্রভৃতি পর্যালোচনা এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত। ১৮৫২ সালে জি. সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' ও তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' সার্থক মৌলিক নাটকের যথার্থ প্রয়াস। এই পর্বে নাটক ধর্মীয় পটভূমি ত্যাগ করে সামাজিক সমস্যামূলক ও মানব জীবনকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। গোড়ার দিকে ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ হলেও মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাতে নাটকের যথার্থ মুক্তি ঘটে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে কৃষকদের ওপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রাধান্য লাভ করে। ১৮৭২ সালে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা বাঙালির নাট্যচর্চার প্রবণতাকে বাড়িয়ে দেয়। ১৮৭৬ সালের নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের ফলে সমাজ সমস্যামূলক কাহিনি থেকে সরে পৌরাণিক নাট্যধারায় বাংলা নাটক সমৃদ্ধ হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখরা এই সময়ের

বাংলা নাটককে সমৃদ্ধ করেছেন। আবার ১৯০৫ সালে বঙ্গবিচ্ছেদকে কেন্দ্র করে স্বদেশপ্রেম জাগরণের তাগিদে ঐতিহাসিক নাট্যধারার সূত্রপাত ঘটে। বিশ শতকের গোড়া থেকেই আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতির ফলে মানুষের জীবন জটিল হয়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে মানুষের জীবনে সুখ-শান্তি অতিক্রান্ত হয়। স্বাভাবিক কারণেই বাংলা নাটকীয় সামাজিক সমস্যার ব্যাপ্তি ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ দেখা যায় এই সময়ের নাটকে।

তৃতীয় পর্ব: বাংলা নাটকের জগতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একক ও অনন্য। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিদ্যমান নাট্যকার সত্তা সর্বদা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিযুক্ত ছিল। শিল্পীর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে অপ্রতিষ্ঠিত ও অনায়ত্ত রূপসুষমার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত তাঁর শিল্পীসত্তা। তিনি তাঁর আত্মপ্রকাশের অনুরূপ আদর্শ নাট্যসংরূপ সন্ধানের প্রয়াসে কাব্য কবিতার ন্যায় নাটক রচনায়ও প্রায় দীর্ঘ ৬০ বছর ব্যাপৃত থেকেছেন। ১৮৭৬ সালে নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন দ্বারা বাংলা নাটকের কণ্ঠরোধের চেষ্টা এবং গিরিশচন্দ্র কর্তৃক ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাট্যধারার মধ্য দিয়ে স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। এরকম সময়কালে ১৮৮১ সালে বাংলা নাটক জগতে আবির্ভাব ঘটে রবীন্দ্রনাথের। 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১) থেকে শ্যামা (১৯৩৯) পর্যন্ত দীর্ঘ পরিক্রমায় তিনি বাংলা নাটকের এক স্বতন্ত্র যুগের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর নাটক রচনার কালসীমা দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অথচ একই সময় কালে নাটক রচনা সত্ত্বেও তাঁকে স্বতন্ত্র পর্বে আলোচনার যৌক্তিকতা এই পর্বের আলোচ্য বিষয়।

চতুর্থ পর্ব: রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটক মূলত নাট্য আন্দোলনের যুগ হিসেবে চিহ্নিত। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা নাটক প্রথাগত রীতি থেকে মুক্তি লাভ করে। বিজন ভট্টাচার্যের হাত ধরে বাংলা নাটকে গণনাট্যের সূত্রপাত। ক্রমে ক্রমে নবনাট্য,

অ্যাবসার্ড নাটক, থার্ড থিয়েটার প্রভৃতির মধ্য বাংলা নাটক একুশ শতকের দিগন্তে প্লাবিত। এই সময়ের নাটকে সাম্যবাদী ভাবধারা প্রাধান্য লাভ করে। চরিত্র চিত্রণে একক নায়কের জায়গায় জনগণ প্রধান হয়ে ওঠে। মানব মনের জটিল মনস্তত্ত্ব গুরুত্ব লাভ করে। কম সময়ের মধ্যে ঘটে যাওয়া দুই মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় মানব সভ্যতার পাশাপাশি মানব মনও জটিল হয়ে পড়ে। মানুষের মন থেকে হারিয়ে যায় বিশ্বাস, ভালোবাসা। দেখা দেয় অস্তিত্বের সংকট। সমসাময়িক বাস্তব জগৎ সম্পর্কে নাট্যকারদের সচেতনতা দেখা দেয়। এই সময়ের নাট্যকারদের নাটকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নাট্য কাহিনি বা প্লটের শিথিলতা, কার্যকারণ সম্পর্কহীনতা প্রভৃতি বিষয়। সময় এবং সমাজের পরিবর্তনে বাংলা নাটকের বিবর্তনের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ের বিভিন্ন পর্বগুলিতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় যথার্থ শিল্পীসত্তাকে অনুসন্ধান করতে কাব্য কবিতায় কালক্ষেপণ না করে নাটক রচনায় ব্যাপৃত হন। যুদ্ধবিধ্বস্ত, মৃত্যু, নৈরাশ্যপীড়িত, হতাশাব্যঞ্জক অস্তিত্ব সংকটাপন্ন মানব সমাজ ও মানবজীবনকে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি এমন এক শিল্প মাধ্যমের সন্ধান করেছিলেন যা প্রথাগত রীতিসর্বস্ব নিয়মানুগ নাটক থেকে স্বতন্ত্র। কারণ তিনি পূর্বেই উপলব্ধি করেছিলেন বাস্তবধর্মী নাটকের মধ্য দিয়ে মানবতার সার্বিক প্রকাশ সম্ভব নয়। সাধারণত রিয়ালিস্টিক নাটকে মানবজীবনকে বর্তমান কালের প্রেক্ষিতে বিচার করার পক্ষপাতি। কিন্তু আমাদের জীবন কেবল কোন একটা কালে নয়, তা তিন কালেই (অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ) আবর্তিত। তাঁর প্রথম নাটক ‘কণ্ঠনালীতে সূর্য’ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যজগতে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয় নাটকের অভিনবত্ব নিয়ে। পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে— এ কেমন নাটক। মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর নাটক সম্পর্কে কোনো বিশেষ তকমায় বিশ্বাস করতেন না। অবশ্য পরে তিনি তাঁর নাটকের অভিধা

প্রসঙ্গে 'ম্যাজিক রিয়ালিজম'-এর কথা বলেছেন। নাটকটি তত্ত্বগত বিশ্লেষণে দেখা যায়— এর কাহিনি উদ্ভট, অবাস্তব প্রচলিত ধারায় ভিন্নতম সংযোজন। আপাত অবাস্তব অভূতপূর্ব রোগগ্রস্ত এক অজ্ঞাত পরিচয় আগন্তুক লোককে কেন্দ্র করে অযৌক্তিক ঘটনার মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি। তত্ত্বগত দিক থেকে নাটকটি ম্যাজিক রিয়ালিজম বৈশিষ্ট্যের অনুসারী। অবশ্য পাশ্চাত্যের অ্যাবসার্ড নাটকের সঙ্গে বাংলা অ্যাবসার্ডধর্মী নাটকের সাদৃশ্য অনেক কম। 'মৃত্যুসংবাদ', 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ', 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড', 'গন্ধরাজের হাততালি', 'ক্যাপ্টেন হুররা' প্রভৃতি এই ধারার অনুসারী নাটক। তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'নীলরঙের ঘোড়া'য় ম্যাজিক রিয়ালিজমের প্রভাব অনেক বেশি। তিনি তার 'হীরামন' নাটক 'ব্ল্যাক কমেডি' তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের তত্ত্বগত প্রয়োগের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব প্রতিভা বিকাশের মূলে ক্রিয়াশীল থাকে। মোহিত চট্টোপাধ্যায় যখন নাটক লিখতে শুরু করেন তখন বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ছিল জটিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সংকট নিয়ে জটিল আর্থসামাজিক আবর্তে নাটকের চরিত্রের আদল বদলে যায়। বদলে যাওয়া ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের নিরিখে শিল্পী-সাহিত্যিকদের জীবনদর্শন ভাবনা। জটিল আবর্তে বাস্তব জীবনের বাইরে ব্যক্তিসত্তার অবচেতন স্তরের পরিচয় সন্ধানের প্রয়াস দেখা যায় শিল্পী সাহিত্যিকদের মধ্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপে আধুনিকতার একটা দর্শন চর্চিত হচ্ছিল তার ঢেউ লেগেছিল এদেশেও। সংবেদনশীল কবি ও নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় ইউরোপীয় দর্শনে প্রভাবিত হয়েও তিনি তাঁর স্বাতন্ত্র্য প্রকাশে সমর্থ হয়েছেন। মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর নাটকে বাস্তবের চেতন স্তরের সঙ্গে অবচেতন স্তরের কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়ে নাটকের চরিত্র, বিষয়, আঙ্গিক সৃষ্টি করেছেন। তার প্রথম নাটক 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' ১৯৬৩ সালে গন্ধর্ব নাট্য পত্রিকার

শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। নাটকের বিষয় ভাবনার ভিত্তি স্থাপিত বিশ শতকের বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঊষর ভূমিতে। মানুষের অবচেতন স্তরের পরিচয় উদঘাটন করতে গিয়ে এক জটিল ও ভয়ঙ্কর অদ্ভুত বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছেন নাটককার। যেখানে আপাত উদ্ভট কাহিনির অন্তরালে একজন শিল্পীর স্বপ্ন - ব্যর্থতার ইতিহাস ব্যাপ্ত। দ্বিতীয় নাটক 'নীলরঙের ঘোড়া' ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত। বাস্তব আর কল্পনার মিশ্রণে গড়ে ওঠা এর কাহিনি চারটি দৃশ্যে বিধৃত। আপাত উদ্ভট এক কাহিনির মধ্য দিয়ে সম্পর্কের বুনট ও সম্পর্কের ভাঙ্গন তুলে ধরা হয়েছে এই নাটকে। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয় 'মৃত্যুসংবাদ' নাটকটি। এই নাটকে রয়েছে এক আগন্তুকের কাহিনি যে তার বাবাকে খুন করে পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বুলুদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এই আগন্তুক লোকটির বাবা যে তার অস্তিত্বের মূলাধার আবার অস্তিত্ব সংকটের মূল কারণ। সে তার জন্মদাতাকে হত্যা করার পর নিজেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিবেক বলে উল্লেখ করে। নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় এই চরিত্রটির মাধ্যমে আমাদের প্রচলিত কতগুলি সংস্কারের মূলে আঘাত হেনেছেন। আসলে জন্মদাতাকে হত্যা করা আগন্তুক লোকটির ধারণামাত্র। আগন্তুক লোকটি অস্থির সময়ের সচেতন ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

'গন্ধরাজ হাততালি' নাটকটি ব্যক্তির পরিচয় ও পরিচয় হীনতার সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যুদ্ধ সভ্যতাকে ধ্বংস করে, শান্তি ও প্রেম সভ্যতাকে গড়ে তোলে। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন ভালোবাসা। গন্ধরাজের হাততালি হল এই ভালোবাসার দ্যোতনা। ভালোবাসার বন্ধন না থাকলে জীবন যে নেতিবাচক হয়ে পড়ে তারই এক দৃষ্টান্ত 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' নাটকটি। আলো-আঁধার, বিশ্বাস অবিশ্বাস সবকিছু মিলিয়ে আশ্চর্য ঘটনার ইঙ্গিত দেয় এই নাটক। জীবন প্রত্যয়ী এই নাটকে অগ্নিকাণ্ডের মত দুর্ঘটনায় চন্দ্রালোকও মানুষের জীবনে অভিশপ্ত হয়ে ওঠে। অস্তিত্বের অর্থহীনতার নাটক 'দ্বীপের রাজা'। এখানে স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্নের মধ্যে এটা

সেতুবন্ধন আবিষ্কারের চেষ্টা রয়েছে। ১৯৭০-৭১ সালের ঝড়ের হাওয়ার পটভূমিকায় মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর সাজানো-গোছানো সংসারের চিত্র বর্ণিত 'বাঘবন্দী' নাটকে। বাস্তব আর অবাস্তব আলোছায়ায় সম্পর্কের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন নাটককার। 'রাজরক্ত' নাটকে রাজনৈতিক মাত্রা লক্ষ করা যায়। নাটকে ঘটে যাওয়া ঘটনা গণনাট্য আন্দোলনের উদ্দেশ্যকে দ্যোতিত করে। সমবেত জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় রাজা সাহেবের পরাজয় নিশ্চিত করার ইঙ্গিত রয়েছে এই নাটকে। সাধারণ জনগণের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের কথা তুলে ধরেছেন তাঁর 'মাছি' একাঙ্ক নাটকে। বন্যা কবলিত এক গ্রাম বাংলার কাহিনি এই নাটকে রয়েছে। 'তোতারাম' নাটকে মানবিক মূল্যবোধের কাহিনি বর্ণিত। অবক্ষয়িত সমাজব্যবস্থায় মানবিক মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন তোতারাম চরিত্রের মাধ্যমে। এভাবেই নাটকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনার নিরিখে নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের জীবনদর্শন তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দেশকালের প্রেক্ষাপটে ঘটেছে নাটকের বিবর্তন। এই বিবর্তন পথ ধরে আবির্ভাব ঘটে বিভিন্ন ধারার নাটক ও নাট্যবর্গের। বিশ শতকের চল্লিশ–পঞ্চাশের দশক বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে সন্ধিক্ষণ–ক্রান্তিকালে বলে বিবেচিত। ষাট-সত্তরের দশকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার যুগ। এরকম এক আর্থ-সামাজিক অস্থিরতার যুগে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে মৌলিক নাটকের মন্দা অবস্থা চলেছিল। এরকম এক সঙ্কটজনক অবস্থা থেকে বাংলা নাটককে গতিতে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, সলিল সেন, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও মনোজ মিত্র প্রমুখ কৃতিমান নট ও নাটককাররা। সমকাল বা প্রায় সমকালে আবির্ভূত এই সকল নট ও নাটককারগণ একই সমাজের প্রতিনিধি হয়েও প্রত্যেকে তাঁদের

নাট্যসৃজনকে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় চালিত করেছেন। স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী কালে নাট্যভাবনা সঙ্গে। স্বাতন্ত্র্য শুধু আঙ্গিক ভাবনা, চরিত্র-চিত্রণ, সংলাপ সৃষ্টিতে নয়, স্বাতন্ত্র্য মঞ্চায়নের ক্ষেত্রেও। এই সময়কালের নাট্যকারদের হাতেই বাংলা নাটকের যথার্থ মুক্তি ঘটে। নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্র চিত্রণ, নাট্য আঙ্গিক প্রভৃতি বিষয়ে তিনি তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য নাট্যকারদের থেকে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্যের বিষয় পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

বিশ শতকের ষাটের দশকে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক জটিলতায় সৃষ্টি হয় গণনাট্য, নবনাট্য, থার্ড থিয়েটার, অ্যাবসার্ড থিয়েটার প্রভৃতি নাট্য আন্দোলনের। এই সময়কার সকল নাট্যকার প্রায় কোনো না কোনো নাট্যমঞ্চের কর্ণধার, নির্দেশক,পরিচালক বা অভিনেতা ছিলেন। মঞ্চের প্রয়োজন মেটাতে তাঁদের সৃষ্টি করতে হয় নাটকের। বিশ শতকের ষাটের দশকের সমসাময়িক নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় কোন নাট্য সংস্থার কর্ণধার বা অভিনেতা ছিলেন না। তিনি একের পর এক অসাধারণ নাটক সৃষ্টি করেছিলেন যা নাটকের জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী। সুতরাং মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সৃষ্ট নাটক বঙ্গ রঙ্গমঞ্চকে কতখানি সমৃদ্ধ করেছিল সে পরিচয় ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

বিশ শতকের ষাটের দশকে বাংলা নাটকের মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের অ্যাবসার্ডধর্মী নাটক রচনায় খ্যাতি লাভ করেছেন। যে সময়কালে তিনি তার শৈশব অতিবাহিত করেছেন, সে সময় ছিল অত্যন্ত জটিল। সমসাময়িক অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং পারিবারিক অভিজ্ঞতা তাঁর নাটকের বিষয়বস্তুতে উঠে এসেছে। নাটক রচনায় তিনি প্রথাগত রীতি ভেঙে দিয়েছেন। চরিত্র সৃজনেও পাশ্চাত্যপন্থী অ্যাবসার্ড রীতির অনুসরণ করেছেন। তিনি তাঁর নাটকের সৃষ্ট

চরিত্রের মধ্যে একইসঙ্গে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের বিকাশ ঘটিয়েছেন। বাংলা নাটকে তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি কোন নাট্যসংস্থার কর্ণধার বা পরিচালক বা অভিনেতা ছিলেন না। সমসাময়িক সকল নাট্যগোষ্ঠী তাঁর সৃষ্ট নাটক দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি তাঁর নাটকে মানুষের বাহ্য পরিচিতিকে উপেক্ষা করে অবচেতনের রহস্য উন্মোচন করেছেন। তিনি পাশ্চাত্যের অ্যাবসার্ড নাটকের হতাশা ব্যঞ্জক পরিণামের পরিবর্তে শুভ ও সুন্দরের জয় ঘোষণা করেছেন।

'মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক : জীবন ও শিল্প' বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে গ্রন্থকৃত পাঠ ও তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বানান বিধি অনুসরণ করেছি। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে প্রথমেই যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি তা হল, তাঁর অধিকাংশ নাটকই কোন না কোন নাট্য পত্রিকায় প্রকাশিত। তাঁর কয়েকটি মাত্র নাটক 'মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটক সমগ্র', 'দশ কথা', 'দশ রূপক', 'নাট্য সংকলন, এবং 'নির্বাচিত সংকলন, গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাঁর অগ্রন্থিত বেশ কয়েকটি নাটক বিভিন্ন পত্র–পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করতে সমর্থ হলেও কয়েকটি নাটক সংগ্রহে আমি ব্যর্থ হয়েছি। প্রাপ্ত এই নাট্যগ্রন্থগুলো সংগ্রহ করতে দ্বারস্থ হয়েছি- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রামমোহন লাইব্রেরী, কলকাতা লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী, মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। এই সমস্ত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারের কর্মী এবং আধিকারিকদের সাহায্য ব্যতীত আমার এই গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান আধিকারিক সন্দীপ দত্ত মহাশয়কে। 'মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক: জীবন ও শিল্প' এই বিষয়ে গবেষণা কার্যে আমার তত্ত্বধায়ক অধ্যাপক ড. সুজিতকুমার পাল মহাশয়ের নির্দেশনা ও পরামর্শ

গ্রহণ করেছি। যাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও সহযোগিতা ব্যতীত এই গবেষণাকর্মটিকে সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। তাঁর প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য মহোদয় এবং বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও অন্যান্য অধ্যাপক অধ্যাপিকাগণকে। এছাড়া কৃতজ্ঞতা জানাই আমার গবেষণাকর্মে সাহায্যকারী সমস্ত শুভানুধ্যায়ী বন্ধু এবং মৃন্ময়ীকে। বাবাও মা'কে আমার বিনম্র প্রণাম ও পরিবারের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই সর্বদা পাশে থাকার জন্য। আমার গবেষণাটিকে যথাযথ রূপদানে সাহায্যকারী অমিতদাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। 'মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক : জীবন ও শিল্প' এই গবেষণাকর্মটি যদি পাঠক, গবেষক, ছাত্র-ছাত্রীদের কোন কাজে লাগে তবেই আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস সার্থকতা লাভ করবে।